সাংস্কৃতিক স্বৈরাচার মোকাবেলায়
নি র্বা চি ত প্র ব ন্ধ

আল মাহমুদ

বাঙালি মুসলমানের শত্রুমিত্র

বই :	**বাঙালি মুসলমানের শত্রুমিত্র**
লেখক :	আল মাহমুদ
সম্পাদক :	মুহিম মাহফুজ
প্রকাশনায় :	কাতেবিন প্রকাশন
প্রকাশনা সহযোগিতায় :	শাশ্বত প্রকাশ

সাংস্কৃতিক স্বৈরাচার মোকাবেলায়
নি র্বা চি ত প্র ব ন্ধ

আল মাহমুদ

বাঙালি মুসলমানের শত্রুমিত্র

সম্পাদনায়
মুহিম মাহফুজ

প্রকাশনায়
কাতেবিন প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা, ২২ নং দোকান,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৬৭৬৫৯৯৩২৪, ০১৯৭৬৫৯৯৩২৪

প্রকাশনা সহযোগিতায়
প্র কা শ

উৎসর্গ

মুক্তিযোদ্ধা হাফেজ আবুল কাশেম-
আমার আব্বা
আমার শিকড়।

বৃক্ষ কখনো শিকড় ডিঙোতে পারে না।

সূচি

- সম্পাদকের কথা / ১১
- আমি ও আমার কবিতা / ১৩
- কবির আত্মবিশ্বাস / ২৩
- কবির আত্মবিশ্বাস: ২ / ৩৩
- অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়তে হলে / ৩৯
- সাংস্কৃতিক দিগন্তে নতুন আশার ঝলক / ৪১
- বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত / ৪৬
- আশা ও আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত তারুণ্য / ৫০
- ভাষাগত ঐক্যের সুযোগ আত্মঘাতী খেলা / ৫৬
- ইতিহাস কাউকে রাখে কাউকে রাখে না / ৬১
- ইসলামকে তালগোল পাকিয়ে ফেলা শুভ লক্ষণ নয় / ৬৭
- ধর্ম এখন তৃতীয় মাত্রায় উপনীত / ৭৩
- বিশ্বাসের লড়াইয়ে আন্তরিক হতে হবে / ৭৮
- দেশপ্রেমিক বিশ্বাসী তরুণদের নতুন মোর্চা চাই / ৮৪
- কোনো সময়ই মুসলমানদের জন্য খারাপ সময় নয় / ৯০
- ফেব্রুয়ারি : সাংস্কৃতিক মাস্তানির মাস / ৯৫
- নববর্ষ ও হাতির প্রতীক / ১০০
- চিন্তাচর্চার শূন্যগর্ভ ইমারত / ১০৪
- এ সূর্য আমাদের আলো দিতে আসেনি / ১০৭
- আহমদ শরীফরা ব্যবহারেরও অযোগ্য হয়ে পড়ছে / ১১১
- কলকাতার বই: মুখোসধারী আধিপত্য / ১১৬
- লেখক শিবিরের ইসলাম বিরোধিতা / ১১৯
- বাংলা একাডেমি ও একুশের মর্যাদা / ১২৫
- পৌত্তলিক সাহিত্যের আগ্রাসন / ১২৯

- জাতীয় সংস্কৃতি এখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন / ১৩৩
- ধর্ম নিয়ে ফাজলামি / ১৩৬
- অযথা প্রগতিবাদের দোহাই দেবেন না / ১৪১
- কবি, প্রতিক্রিয়াশীল / ১৪৬
- রবীন্দ্রপ্রতিভা ও সভ্যতার আকাঙ্ক্ষা / ১৫১
- কলকাতার বাঙালিরা এখন কল্কে পাচ্ছে না / ১৫৪
- আজান ও উলুধ্বনিকে একাকার ভাববেন না / ১৫৯
- বাংলাদেশের কবি-লেখকদের আত্মবিরোধ / ১৬৩
- লক্ষ প্রাণের সজীবতার উৎস / ১৬৭
- ঈদে মিলাদুন্নবীর উৎসব মুখর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান / ১৭২
- আমরা চাই নতুন কাব্যান্দোলন গড়ে উঠুক / ১৭৫
- সাহিত্যে কালো'র থাবা এবং আলোর প্রতিশ্রুতি / ১৭৯
- ভারতের বিশালত্বের অহংকার / ১৮৩
- ভারতের সাথে তিক্ততার আদি কারণ / ১৮৬
- পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা এবং অনুপ্রবেশের শ্লোগান / ১৯০
- ঢাকা মসলিনের মতো স্বচ্ছ হলেও রেশমের মতোই মজবুত / ১৯৪
- ডিসেম্বরে স্মৃতি-বিস্মৃতি হাতড়ে / ১৯৮
- অন্তরের সরলতাই সঠিক পথের দিশারী / ২০৩
- বইমেলা ও লেখকের স্বার্থ / ২০৯
- মানুষ পুনরাবৃত্তি চায় না, পরিত্রাণ চায় / ২১৪
- পবিত্র মাসে নতুন উপলব্ধি / ২১৯
- দাউদ হায়দার ও কালো বিড়াল / ২২৪
- মার্কসবাদীদের কাব্য বিচার / ২২৮
- সাহিত্য শিল্পে সুবিচার প্রতিষ্ঠার লড়াই / ২৩২
- হজম-বদহজমের কাহিনি / ২৪৩
- বুদ্ধিজীবী মানুষের সময়ের মূল্য দিতে হবে / ২৪৯

- দক্ষিণ বাংলা হায় আল্লাহ / ২৫৫
- পার হই দিন আর পার হওয়া দীর্ঘ আয়ুষ্কাল / ২৬১
- সত্যের চেহারা / ২৬৬
- বাঁচতে হলে বেচতে হবে? / ২৭১
- প্রাণ ধারণের গ্লানি / ২৭৫
- আমি, আমার সময় এবং আমার কবিতা / ২৭৯
- পরাজয় কবির নিয়তি হতে পারে না / ২৯৪
- একটু আড়াল চাই / ৩০০
- তসলিমার ব্যাপারে বাইরের হস্তক্ষেপ / ৩০৪
- সংসদে 'দ্বিতীয় তসলিমা' প্রসঙ্গ / ৩১০
- বাংলাদেশের আকাশ ঘন মেঘে আবৃত / ৩১৬
- কাজী নজরুল ইসলাম / ৩২২
- ন্যায়ের পথে নিঃসঙ্গ কবি / ৩২৬
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মরণে / ৩৩৩
- কবি ফর্‌রুখ আহমদ / ৩৩৮
- বঙ্কিম ও সুনীল /৩৪২
- প্রিয় শাহরিয়ার / ৩৪৭
- বিপ্লবী কবি তাহেরা সফরজাদেহ / ৩৫১
- তার জন্য অপেক্ষা করি, উৎকর্ণ হয়ে থাকি / ৩৫৬
- কবির জীবনকে খানিকটা অর্থবহ ভাবতে দোষ কী? / ৩৬১
- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান আমাদের সোনালী অতীতের শেষ আস্তিন / ৩৬৬
- শাইখুল হাদিস আল্লামা আজীজুল হক তার কাব্যের তুলনা বিশ্বসাহিত্যেও বিরল / ৩৬৮
- আমি একলা পথেরই যাত্রী / ৩৭০
- পৌঢ় কবির প্রতিশ্রুতি / ৩৭৬

- কবির সামাজিক মর্যাদা / ৩৮০
- একটি ব্যক্তিগত আক্ষেপ / ৩৮৮
- ফিলিস্তিন আমার হৃদয়জুড়ে / ৩৯২
- কবি হিসেবে আমার বিশ্বাসই আমার সার্থকতা / ৩৯৪

সম্পাদকের কথা

সমুদয় রচনার মধ্যে প্রবন্ধাবলিতে ব্যক্তি আল মাহমুদ যে সবচেয়ে প্রতিভাত, পাঠক মাত্রই তা উপলব্ধি করবেন। লেখকের ব্যক্তি ও আদর্শগত পরিচয় বাদ দিয়ে শুধুই রচনা পাঠ অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখকের উদ্দিষ্ট তাৎপর্য অনুধাবন থেকে পাঠককে অসমর্থ্য করে রাখে। আল মাহমুদের ব্যক্তিগত ও আদর্শগত পরিভ্রমণ উপলব্ধি করতে কবিতা, ছোট গল্প ও উপন্যাসের চেয়ে প্রবন্ধসমূহ অতিশয় প্রাসঙ্গিক ও দরকারি।

স্বাধীনতা উত্তর বাকশাল আমলে শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে কারান্তরীন হন আল মাহমুদ। এই কারাবরণ যে অন্যায্য ছিল মুক্তি পরবর্তীকালে শেখ সাহেবের দায়মোচনমূলক সিদ্ধান্তে এটা সরলভাবেই অনুমান করা যায়। আল মাহমুদও এ বিষয়ে খোলামেলা মন্তব্য করতে কসুর করেননি। আল মাহমুদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে কারাবরণের কারণে যে দুর্বিষহ ভয়াবহতা নেমে এসেছিল, একথা নিশ্চয়ই সত্য। তবে এর চেয়ে বড় সত্য, এই কারাবরণই আল মাহমুদের যাবতীয় চিন্তার কল্যাণকর পরিবর্তনে সহায়ক হয়েছিল।

কমিউনিজম ও বাংলাদেশি কমিউনিজমজাত অন্ধ নাস্তিকতা থেকে ইসলামের দিকে পরিবর্তনের কারণে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যে শত্রুতার মুখোমুখি তাকে হতে হয়েছে, সে সবের বিবরণ তার প্রবন্ধ। প্রবন্ধেই আল মাহমুদ অকপটে প্রকাশ করেছেন তার বাঁকবদলের কার্যকারণ এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর। সে কারণে প্রবন্ধাবলি পাঠ ব্যতীত আল মাহমুদের ব্যক্তিমানস ও দার্শনিক মানসের অনুসন্ধান অসম্পন্ন থাকে। কিন্তু আশ্চর্যভাবে লক্ষ্যণীয়, আল মাহমুদের প্রবন্ধসমূহই সবচেয়ে কম পঠিত ও চর্চিত। সারা জীবন যারা কবির বিরোধিতায়

নিয়োজিত ছিলেন, প্রবন্ধে কবি তাদের অন্তঃসারশূন্যতার প্রবল সমালোচক ছিলেন বলে তাদের অনাগ্রহ সম্পর্কে অনুমান করা যায়। কিন্তু যাদের পক্ষাবলম্বন করে সংগ্রামরত আল মাহমুদ আমৃত্যু সরব ছিলেন, তারাও আল মাহমুদ পাঠে বিশেষত প্রবন্ধে অনীহ থাকবেন, এটা অনানুমেয়। তবু বাস্তবতা ভিন্ন কিছু নয়। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেই বক্ষমান গ্রন্থের অবতারণা।

যেসব প্রবন্ধে আল মাহমুদ সরব ছিলেন বাংলাদেশ, বাঙালি মুসলমান, বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি-সাহিত্য-ইতিহাস-রাজনীতি ইত্যকার জনগুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ ও অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেসব রচনাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত হয়েছে। ফলে বাঙালি মুসলমান সমাজ নির্বাচিত রচনাসমূহ দল থেকে উপকৃত হবেন বলে আশা করি।

-মুহিম মাহফুজ
নয়াগাঁও, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ

আমি ও আমার কবিতা

আমি আমার জীবন সম্বন্ধে নানা রং লাগিয়ে দু'চার কথা বলতে পারি বটে কিন্তু কবিতা সম্বন্ধে বলাই আমার পক্ষে দুরূহ কাজ। জীবন সম্বন্ধে বলতে পারি কারণ প্রায় খরচ করে ফেলা একটা গোল্লায় যাওয়া বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বেশ মজাই লাগে। কৈফিয়ত চাওয়ার কেউ নেই। অনুতাপ করারও তেমন কিছু দেখতে পাই না।

আমি জন্মেছিলাম সাবেক কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মৌড়াইল নামক মহল্লার এক বাড়িতে। বাড়িটিকে আজও মোল্লাবাড়ি বলে ডাকা হয়। জন্মেছিলাম একটি প্রাচীন রক্ষণশীল ধর্মীয় পরিবারে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে নেতৃত্বদান, বস্ত্র, দারু ও গন্ধদ্রব্যের ব্যবসায়ই ছিল পূর্বপুরুষদের জীবিকার উপায়। সুলতানি আমল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল পর্যন্ত এরা ধর্মীয় লেখাপড়া ও ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সারা উপমহাদেশে ঘুরে বেড়াতেন। বলা যায় এরা ছিলেন যাযাবর শ্রেণির আলেম। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিদ্বিষ্ট এরা আরবি-ফারসিকেই শিক্ষার বাহন করে নিয়েছিলেন। এরা বাংলাও ভালো জানতেন কারণ নিজের দেশে যেহেতু জনগণের মধ্যে সহজ ভাষায় শরিয়তের নিয়ম-কানুন চালু করতে চাইতেন সে কারণে দেশি ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষার প্রতিও এদের পক্ষপাত ছিল। আমার দাদা জারি-সারি ও মর্সিয়া লিখতেন।

শিক্ষা ও ব্যবসায় উপলক্ষে যেহেতু এরা উপমহাদেশের স্থান থেকে স্থানান্তরে বাজার, কসবা ও হাটে ঘুরে বেড়াতেন, সে কারণে এদের হৃদয় ছিল খোলামেলা। এরা জাতিভেদ ও ভাষাভেদের তোয়াক্কা করতেন না। কেউ কেউ আবার অন্য প্রদেশ থেকে স্ত্রীও গ্রহণ করেছিলেন। কেউ আবার উপমহাদেশের বাইরের কোনো বুজুর্গ ব্যক্তির হাতে কন্যাও দান করেছিলেন। মোটকথা আমাদের পরিবারটি ছিল একটি অদ্ভুত ধরনের জগা-খিচুড়ি পরিবার। শাদা-

কালোর মিশেল ছিল এতে। ছিল নানা ভাষা ও আদব-কায়দার মিশেল। কিন্তু একটা ব্যাপারে এরা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন।

বিষয়টা হলো আমার পূর্বপুরুষদের আচরণীয় ধর্ম- ইসলাম। কুরআন-হাদিসের বরখেলাফ কোনো কিছু এরা সইতে পারতেন না। ব্রিটিশ আমলে হাজী শরিয়তুল্লাহর সংস্কার আন্দোলনকে এরা জানমাল ও হৃদয় দিয়ে সমর্থন করেছিলেন। এ কারণে দুর্গতিও কম পোহাতে হয়নি। এরা অতীতে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কোনো চাকরি গ্রহণকে ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যদিও এ দম্ভ শেষ পর্যন্ত টেকেনি। তবুও দেড় শতাব্দী পর্যন্ত তারা তাদের জেদ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই রহস্যজনক মানুষদের ছিল কবিতার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ। এরা সকলেই কবিতা আবৃত্তি করতে জানতেন। আরবি কাসিদা ও ফারসি বয়েত এদের মুখে মুখে ফিরত। কথায় কথায় এরা কবিতা আবৃত্তি করতেন। ধর্মীয় ওয়াজ নসিহতের সময় এরা এমন সব কবিতা আবৃত্তি করে শ্রোতাদের তাক লাগিয়ে দিতেন, যা শ্রোতারাও মুখস্থ করে ঘরে ফিরত। ধর্মপ্রচারের সুবিধার জন্যই এরা কাব্যচর্চা করতেন। সে কবিতা যে ভাষাতেই রচিত হোক না কেন। এদের অন্দর মহলও কবিতার রস থেকে বঞ্চিত ছিল না। মেয়েরা দু'চারটি ফারসি ছত্র স্বামী-দেওরদের সাথে ঠাট্টা মশকরায় অকপটে ব্যবহার করতে জানতেন।

এই ছিল আমার পারিবারিক পরিবেশ। এদের মধ্যেই ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জুলাই এক বর্ষণের রাতে আমার জন্ম হয়। আমার কৈশোর কালেই আমাদের পরিবার তথা আমার অভিভাবকদের স্থায়ী জীবিকার ক্ষেত্রগুলোতে ভাঙন ধরে। আমাদের ছিল কাপড় ও পাদুকার দোকান। দোকান ফেল মারে। যৎ সামান্য জমিজমার ওপর ভর করে সংসার চালাতে আমার বাপ-মার অসহনীয় কষ্ট হতো। নিঃসীম দারিদ্র্য নেমে আসে আমাদের ঘিরে। এর মধ্যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ঢেউ মফস্বল শহরগুলোতে আছড়ে পড়লে আমি এতে জড়িয়ে পড়ি। ভাষা কমিটির একটি লিফলেটে আমার চার লাইন কবিতার উদ্ধৃতির গন্ধ শুঁকে পুলিশ এসে আমাদের বাড়িতে হানা দেয়। আমার বাপ তখন অসুখে শয্যাশায়ী। পুলিশ বাড়ি তছনছ করে আমাকে খোঁজে। আমি তখন দশম শ্রেণির ছাত্র। গা ঢাকা দেই। এক জেলা থেকে অন্য জেলা, এক শহর থেকে অন্য শহর। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে ১৯৫৪ তে ঢাকায় এসে হাজির হই। আমার একটি জীবিকার তখন একান্ত দরকার।

আমার কয়েকটি গল্প কবিতা তখন এখানকার পত্রপত্রিকায় হঠাৎ প্রকাশ পাওয়ায় আমি স্থির করি সাহিত্যচর্চাই আমার জীবনের ব্রত হবে। এই ব্রত উদযাপন জন্য একটি সহায়ক জীবিকা খুঁজতে থাকি। এ সময় আমার পূর্ব পরিচিত এক গল্প লেখক লুৎফর রহমানের শরণাপন্ন হই। তিনি আমাকে জনাব রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই) এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। দাদা ভাই আমার অবস্থা শুনে আমাকে দৈনিক মিল্লাতের প্রুফ সেকশনে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। পরে আমি নিজের চেষ্টায় নজমুল হকের সাপ্তাহিক কাফেলায় সহসম্পাদকের শূন্য পদে যোগদান করি। এ ভাবেই আমার ঢাকায় স্থায়ী বসবাস ও সাহিত্যচর্চার দৈব সুযোগ সৃষ্টি হয়। তখনও বয়েস কৈশোরের সীমা অতিক্রম করেনি।

আমার পরবর্তী জীবন ঘটনাবহুল, তরঙ্গসঙ্কুল ও জটিল। এর কিছু ঘটনা আছে যা ব্যক্ত করা যায়। আর কিছু অব্যক্ত ও অকথ্য। আমি পথের একজন সাধারণ মানুষের বন্ধুত্ব যেমন অনায়াসে অর্জন করেছি, তেমনি দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর মানুষ জাতীয় ইতিহাসের অমোঘ ব্যক্তিত্ব যেমন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সান্নিধ্যে যেয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, হৃদ্যতা, বিরুদ্ধতা এবং রাষ্ট্র ও জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অতিশয় গোপনীয় মত বিনিময়ের সুযোগ পেয়েছি। এর পরিণাম যে আমি ও আমার পরিবারের পক্ষে অহরহ শুভ হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। মতবিরোধের জন্যে কিংবা বলা যায় আমার চিন্তা-ভাবনার কবিসুলভ সামান্য স্বাতন্ত্রের জন্যে আমাকে শাস্তিও পেতে হয়েছে। যেমন ১৯৭৪ সালটা অযথা জেলের ভেতর কাটাতে হয়েছে। পরে অবশ্য ভুল বোঝাবুঝির অবসান হলে যিনি অন্যায়ভাবে শাস্তি দিয়েছেন তিনিই আবার আমার মতো একজন নগণ্য কবির জন্য একটি যোগ্য পেশা ও পদ অনুসন্ধান করতে কেবিনেটের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীকে আমার সাক্ষাতেই টেলিফোনে ডেকে পাঠিয়েছেন। বর্তমানে আমি অবশ্য তার দেয়া চাকরিতেই নিয়োজিত আছি। মোটকথা এদেশের কৃষক-শ্রমিক, জেলে-জোলা, কামার-কুমারদের পর্ণকুটির থেকে বঙ্গভবন পর্যন্ত আমার জন্য একটা সেতুবন্ধ তৈরি হয়েছিল। এই সেতু নির্মাণে আমার কাছে কোনো আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ ছিল না। ছিল না কোনো মন্ত্রতন্ত্র বা রাজনৈতিক ভেল্কিবাজি। সম্বল ছিল শুধু কবিতা। আমার রচনার কয়েকটি শীর্ণকায় পুস্তক মাত্র। আর অন্যেরা হেসে উড়িয়ে দিলেও, যৎসামান্য কবিখ্যাতি।

হ্যাঁ, কবিতাই আমার পুঁজি। কবিতার জন্যেই যত খ্যাতি ও অখ্যাতি! কবিতার জন্যেই বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে বেড়ানো। শহর থেকে শহরে, দেশ থেকে দেশান্তরে

উড়াল। কবিতার জন্যই, বাংলাদেশে এমন কোনো নদী নেই যাতে আমি সাঁতার কাটিনি। নদীর সাথে নারীর উপমা, কেন? কবিতার জন্যই। মানুষের সাথে মানুষীর, এক দেশের সাথে অন্য দেশের, জাতির সাথে অপর জাতির সম্বন্ধসূত্র খুঁজে বেড়ানো তো কবিতার জন্যেই। আমি পবিত্র কাবার চারদিক বার বার তাওয়াফ করেছি, সাফা থেকে মারওয়া পর্বতের দিকে দৌড়ে গেছি —সিজদায় উবুড় হয়ে পড়েছি আল্লাহর কাছে। বলেছি, প্রভু আমি একজন কবি, কবিকে করুণা করো।

পবিত্র নগরী মদিনার গলিপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, জান্নাতুল বাকীর কবরগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমি কবি হাসসান ইবনে সাবিতের কথা কত ভেবেছি। এই নগরীতেই তো দেড় হাজার বছর আগে বাস করতেন হাসসান। মসজিদুন নবির মিম্বরে দাঁড়িয়ে তিনি যখন তার সদ্য লেখা কবিতায় আল্লাহ ও রসুলের প্রশংসা করে সাম্য ও মৈত্রীর আহ্বান আবৃত্তি শুরু করতেন তখন জগতের সেরা মানব হজরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত কবির প্রতি প্রীত হয়ে উঠতেন। হাসসান ইবনে সাবিতের কত অপরাধকে তিনি মার্জনা করেছেন। একবার ঈজিপ্টের কপটিক আর্চবিশপ আল্লাহর নবি হজরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে কিছু মূল্যবান মিশরীয় উপহার সামগ্রীর সাথে দু'জন কিবতি যুবতিকে উপঢৌকন হিসেবে পাঠান। তাদের একজন উম্মুল মোমেনীন (বিশ্বাসীদের মাতা) মারিয়া কিবতিয়া—যাকে আল্লাহর রসুল স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। অপরজন শিরিন কিবতিয়া— যাকে নবি করীম কবি হাসসান ইবনে সাবিতের সাথে বিয়ে দেন তার অসাধারণ কবি প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ। সবই তো কবিতার জন্য।

আমি কতজনকে হাসসানের কবরটা কোথায় দেখিয়ে দেয়ার জন্য মিনতি করেছি। কিন্তু কেউ পারেনি। পরে ভেবেছি না থাক, কবির কবরের চিহ্ন, সীমাবদ্ধ এপিটাফে উৎকীর্ণ কবির প্রশংসা কী দরকার? তার কবিতাই তো রয়েছে তরঙ্গের ফেনোচ্ছ্বাস নিয়ে। আর তা কাল থেকে কালান্তরে লাফিয়ে পড়েছে। যা গুঞ্জরিত হবে অনাদিকালের মানব মানবির হৃদয় কন্দরে।

আমি কবি ও কবিতাকে এভাবেই দেখি। সে জন্যেই বলি, নিজের প্রসঙ্গে দু'চার কথা বলা যায় বটে কিন্তু নিজের কবিতা সম্বন্ধে দায়িত্ব নিয়ে একটি বাক্য উচ্চারণও দুরূহ ব্যাপার। তবে আমি আমার কবিতায় কী করতে চেয়েছি এবং যা করতে গিয়ে ব্যর্থতা ও যৎসামান্য সাফল্যের যে নিমক চেখেছি এ নিয়ে দু'এক কথা বলা হয়তো বেমানান হবে না।

আমি লেখা শুরু করি মধ্য পঞ্চাশে। অর্থাৎ ১৯৫৪-৫৫ খ্রিষ্টাব্দে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সত্যযুগ পত্রিকার একটি গল্প দিয়ে এর আগেই আমার সাহিত্য জীবন শুরু হয়। পরে অবশ্য একই পত্রিকায় শ্রী গৌরকিশোর ঘোষ আমার একটি কবিতা প্রকাশ করেন। এভাবেই কৈশোরিক রচনার সূত্রপাত।

চুয়ান্নর শেষের দিকে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস। এ সময় শহীদ কাদরী, ফজল শাহাবুদ্দীন ও ওমর আলীর সাথে পরিচয়। প্রথমোক্ত দু'জন আমার আজীবন সাহিত্য সঙ্গী। এদের সাথেই ঘটেছে আমার কবি হিসেবে, বন্ধু ও সুহৃদ হিসেবে সর্বপ্রকার সাহিত্যিক বিনিময়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রেষারেষি ও আন্তরিকতা। যাকে আমি বলি কাব্যহিংসা তার অংশীদার আমার সাথে মাত্র দু'জন, ফজল ও শহিদ। পরে অবশ্য এর পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। এমনকি স্বদেশ ও স্বজাতির সীমা অতিক্রম করে তা অন্যত্র পড়েছে বলেও অনুভব করেছি। পশ্চিমবঙ্গের বড় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় একবার আমাকে উদ্দেশ করে লেখা একটি কবিতায় বলেছিলেন :

কলকাতার গলি থেকে আল মাহমুদ বিদায় নিয়েছে
ওর শরণার্থী চোখ কোনদিন দেখতেও হবে না।
জানি না আহত হয়ে গেছে কিনা ভুল ব্যবহারে,
আমার আড়ালে আমি হয়েছি না-হয়েছি হিংসুক।
মনে পড়ে আল মাহমুদ? কিংবা মনে প্রকৃত পড়ে না
ক্ষিপ্ত ও কোমল বাংলাভাষা নিয়ে সহোদর তুই
দৌড়ে এলি- ওই অস্ত্র, ওই সুখ, স্বপ্ন ভালোবাসা
আমারও আয়ত্ত, তবু আজীবন স্বপ্নের ভিতরে। ওষ্ঠাগত প্রাণ,
হাড়, গ্রন্থি আর নিরুৎসব মেদ এ সবই দেখেছি,
চোখে পড়ে নি শ্যামল, নীলাঞ্জন
যার ভ্রুভঙ্গির দাম বাংলাভাষা রাজ সিংহাসনে...
(শরণার্থী বাংলাভাষা, পুনর্জন্মে অস্ত্রের গৌরবহীন একা, পৃষ্ঠা, ২৩)

আমি যাকে কাব্যহিংসা বলি আসলে এর উল্টো পিঠেই সম্ভবত লুকিয়ে আছে সহযোগ, বন্ধুত্ব, আন্তরিকতা ও সহবাস। কবিরা, যে যেখানেই থাকুন, যে ভাষাতেই লিখুন— হোক তা বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি, আরবি, ইতালীয় বা স্প্যানিশ- এরা পরস্পর সহোদর। এদের একটাই মাতৃভাষা- কবিতা।

১৯৫৫ তে কোনো এক গ্রীষ্ম সংখ্যা 'কবিতা'য় বুদ্ধদেব বসু আমার তিনটি কবিতা ছাপেন। কবিতাগুলোর নাম ছিল 'প্রবোধ', 'একদিন অন্ধকারে' ও 'সিম্ফনি'। আমার জীবনে আমি যে কয়টা আনন্দদায়ক মুহূর্ত এই ব্রহ্মাণ্ডে মানুষ, পশুপাখি, নদী ও সমুদ্রের জলজ প্রাণিদের প্রেম, ঘাম ও ক্লেদে পরিপূর্ণ— পারমাণবিক ধোঁয়ার কুণ্ডলী, শব্দভেদী জেটের জ্বালানি আর মানুষের রক্ত, বমি ও বিষ্ঠায় দুর্গন্ধময় গ্রহটিতে কাটিয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে পুলকময় মুহূর্ত ছিল বুদ্ধদেবের 'কবিতা' পত্রিকায় আমার কবিতা প্রকাশের সম্ভাবনার সংবাদ। বুদ্ধদেব লিখেছিলেন, 'প্রীতিভাজনেষু, তোমার একটি বা দুটি কবিতা ছাপা যাবে মনে হচ্ছে।'

একটি মাত্র বাক্য কিন্তু ১৯৫৫ সালে বাংলাভাষায় একজন নবীন কবির জন্য কী অসাধারণ! যেন অনেকটা দৈববাণীর মতো। বুদ্ধদেব বসুর রাসবিহারী এভেন্যুর তৎকালীন আবাসস্থল কবিতাভবনের স্মৃতিচিহ্ন আঁকা সাদা পোস্টকার্ডটি আমার মনে আজও দাগ কেটে বসে আছে।

পরবর্তীকালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কলকাতায় এক বিদেশি কূটনীতিকের ভোজসভায় যখন আকস্মিকভাবে বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসুর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় আমি তার কাছে এই সহৃদয় সম্পাদকীয় শনাক্তকরণ ও কবিতা প্রকাশের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলাম। আমাকে দেখে ও আমার সাথে আলাপ করে তিনি গভীর প্রীতিবোধ করেছিলেন বলে আমার মনে হয়েছিল।

এভাবেই আমার শুরু ও যৎসামান্য ব্যাপ্তি। আমি আমার কবিতায় প্রথম থেকেই গ্রামকে উত্থাপন করতে চেয়েছি। ভেঙে পড়া গ্রাম। চরের উত্থান-পতন। গ্রামের মানুষের প্রেম ও প্রতিহিংসা। নদী ও নারীর বহমান লোকজ জীবন ও প্রকৃতি। মাটিতে চাপা পড়া ইতিহাস ও আদিম বাঙালিদের প্রত্ন সম্পদ। লোকগাথায় উল্লিখিত তাদের শৌর্যবীর্যের কাহিনি থেকে আমি আমার কবিতার বিষয় আহরণ করেছি। আমি গ্রামকেই প্রাধান্য দিয়েছি কারণ যাকে বলে ধনতান্ত্রিক নাগরিক জীবন, যা ইয়োরোপ আমেরিকা তখন পাশ্চাত্যের লেখক শিল্পীকে অহরহ নৈঃসঙ্গ্যের বেদনায় যন্ত্রণাকাতর করে, আমি তেমন পরিবেশে বেড়ে উঠিনি। আমি জন্মেছি গ্রামে। আমার চতুর্দিকে যতদূর চোখ যায় শুধু গ্রাম আর গ্রাম। আর শস্যের মাঠ। মাঠের গাঁ ঘেঁষে নদী। নারীর শাড়ির মতো নকশাকাটা তার দু'পাড়। আমার মনে হয়েছে নদী থেকেই বাংলার আদি পোশাকের অর্থাৎ শাড়ির উদ্ভাবন হয়েছে মেয়েদেরই হাতে, কৃষির উদ্ভাবনের মতো। আমি মাছ আর ধানের গন্ধে ভরপুর

মানুষ। যে দেশের পুরুষ তার প্রথম প্রেমিকাকে পাটক্ষেতের ভেতর প্রথম চুম্বনের সুযোগ পায় আমি তো সে দেশেরই কবি! ধনতান্ত্রিক নাগরিক জীবনের বিচ্ছিন্নতাবোধ ও যন্ত্রণাকাতর আর্তি শত দুঃখের মধ্যেও আমাকে ঠিকমত স্পর্শ করেনি। আমি এশীয়। এশিয়া মহাদেশকে যদি বহু বিচিত্র জাতির মহামাতৃকা হিসেবে কল্পনা করা যায় তবে নানা জাতের সুগন্ধি গুল্মলতায় ঘেরা বাংলাদেশের বদ্বীপ অঞ্চলটিকে তার সপ্রতিভ তলদেশ হিসেবে বিবেচনা করতে দোষ কী? আমি আমার দেশকে এ ধরনের উপমা আর প্রতিতুলনার দ্বারা অলংকৃত করে এসেছি।

এশিয়া কোনদিন মানবতাকে পরিত্যাগ করেনি। সারা মানবজাতিকে ঝাড়ে বংশে বিলোপ করার মারণাস্ত্রের আবিষ্কর্তা কোনো এশিয়াবাসী নন। এশিয়া সব ধর্মের সূতিকাগার। বেদ-উপনিষদ, জেন্দাবেস্তা, তৌরাত, বাইবেল ও সর্বশেষ আলৌকিক পথনির্দেশ পবিত্র কুরআন নাজেল হয়েছে এশিয়াবাসীরই ওপর। সব পয়গম্বরই জন্মেছেন এই মহাদেশটিতে। এমনকি মানবজাতিকে একটিমাত্র গায়েবি সহিফার দ্বারা শিক্ষা দিতে কিংবা সতর্ক করতে এসেছেন যে সতর্ককারী, তেমন নবিও এশিয়ার বাইরে জন্মাননি। এশিয়াকে নাস্তিক করা যায় না। যায়নি। কোনকালে নাস্তিকতার ওপর মানবতন্ত্র দাঁড়াতে পারে না। এবার এ নিয়েই প্রখ্যাত মানবতন্ত্রী প্রফেসর শিবনারায়ণ রায়ের সাথে আমার বনল না। তিনি আমার কবিতার অনুরাগী পাঠক হওয়া সত্ত্বেও আমার আস্তিকতাকে মানতে পারেন না। আমিও বিশুদ্ধ নাস্তিকতার ওপর মানবতন্ত্রের সৌধ নির্মিত হতে পারে এমন তত্ত্বকথায় ঘোর অবিশ্বাসী। তাই যদি হতো তবে তো ভারতবর্ষে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো বিশ্ববিচরণশীল বিপ্লবী দার্শনিক দৈত্যই তা পারতেন। অন্য কোনো রায়কে আর ব্যর্থতার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে হতো না। কিংবা নাতির বয়েসী পুঁচকে বাঙালি ছোকরাদের কমিউনিস্টদের খপ্পর থেকে বাঁচতে গিয়ে কার্ল মার্কসের বর্তমানে অকার্যকর কিছু তাত্ত্বিক দলিলের খুঁটিনাটি আলোচনায় অযথা কালক্ষেপ করতে হতো না। কারণ সাম্প্রতিক কালের সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিচারে মার্কসবাদ পৃথিবীতে কোথাও এখন বিপ্লবী শক্তি নয়। অন্তত কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর নেতৃত্বে কোনো দেশে আর বিপ্লব হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বরং কমিউনিজম এখন পুরনো দাগি সাম্রাজ্যবাদীদের মতোই পারমাণবিক মারণাস্ত্র সজ্জিত এক আগ্রাসী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। যে শক্তি ইচ্ছে করলে আফগানিস্তানের মতো পাকিস্তান এবং পরে ভারতবর্ষকেও দখল করে নিতে পারে। আর এই যজ্ঞে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর একটাই ভূমিকা থাকবে। সে ভূমিকা হলো দালালের ভূমিকা। সাম্রাজ্যবাদকে ডেকে

আনার ভূমিকা। এসব কথা কমবেশি বাংলাদেশের অল্প বয়স্ক উঠতি কবি সাহিত্যিকেরাও বোঝে। বুঝতে শুরু করেছে। অন্তত ঘটা করে বোঝাতে হয় না।

অবশ্য প্রফেসর শিবনারায়ণ রায়কে আমার ভালো লাগে মার্কসবাদের অপপ্রয়োগকারীদের সমালোচক হিসেবেই। যদিও তার মার্কসবাদ সম্পর্কিত সমালোচনা প্রবন্ধের সংখ্যা যৎসামান্য মাত্র। তিনি আমার কবিতায় আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গ নিয়ে উৎসাহ দেখিয়ে থাকেন। আমি তার এই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সাহিত্য রুচির অনুরক্ত। আমি আমার কবিতার জন্য একটি পছন্দমত ভাষাভঙ্গি উদ্ভাবন করতে গিয়ে আঞ্চলিক শব্দরাজির সন্ধান পাই। অকস্মাৎ আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত আধুনিক বাংলা ভাষার সমকালীন সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দরাজি বহু কবির বিচিত্র ব্যবহারে ও যথেচ্ছ আচরণে তিরিশ দশকেই বিস্বাদ, এমনকি পরবর্তী কবিদের জন্য গন্ধহীন পুষ্পের পচা স্তূপে পরিণত হয়েছে। এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দৈনন্দিন ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দের যে অক্ষয় ভাণ্ডার রয়েছে সেখান থেকে ব্যাপকভাবে শব্দ আহরণ করে সাহিত্য রচনা করতে না পারলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একঘেয়েমি কাটবে না। এই আহরণ নির্বিচার হলে চলবে না। প্রতিভাবান কবি ও কথাশিল্পীর অন্তরদৃষ্টি সেখানে একান্ত দরকার। অনেকে আমার যুক্তি শুনে তাদের সামগ্রিক রচনাশৈলীকেই আঞ্চলিক ভাষায় দাঁড় করাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। মনে রাখতে হবে আধুনিক বাংলা ভাষার চলতি কাঠামোকে পরিত্যাগ করে নয় বরং এই কাঠামোর মধ্যেই আঞ্চলিক শব্দের কাব্যময় প্রয়োগকে নিশ্চিত করতে হবে। তবেই ভাষা লাফিয়ে উঠবে সমুদ্র তরঙ্গের মতো। বহুবিচিত্র ভঙ্গিতে তা পাঠক সাধারণের মধ্যে ফেটে পড়বে। কোনো বিশেষ জেলার ভাষায় আধুনিক সাহিত্য রচনা করা এক হাস্যকর ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। এ ধরনের প্রয়াসের সাফল্য লাভের কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। তবে আঞ্চলিক শব্দরাজির যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে একথা ভেবেই সম্ভবত ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রণয়ন করে গেছেন।

আমাদের ভাষাও এক স্বতন্ত্র বাংলা ভাষা। আমাদের রাজনীতি নগরীকে ঘিরে মহল্লায় মহল্লায় ইট-কাঠ ও ইমারতের প্রতিটি প্রকোষ্ঠে, সাজানো বিপণিকেন্দ্রে, মাঠে-ময়দানে পাক খাচ্ছে যে নব্য সতেজ শব্দরাজি আর বিচিত্র বাকভঙ্গি যা আধুনিক বাংলাভাষার কাঠামোর মধ্যেই আঞ্চলিক ও প্রাকৃত শব্দের সচ্ছল গতায়াতে জেট প্লেনের মতো গতিশীল, আমরা সেই দ্রুতগামী আধুনিক বাংলাভাষারই কবি। আমি নিজেও।

আমার কবিতার প্রধান বিষয় হলো নারী। আমি এক সময় ভাবতাম একজন কবি পুরুষের কাছে নারীর চেয়ে সুন্দর আর কী আছে? না, কিছু নেই। পৃথিবীতে যত জাতির কবিতায় যত উপমা আছে আমি আমার সাধ্যমত পরীক্ষা করে দেখেছি সবই নারীর সাথে তুলনা করেই। দয়িতার দেহের উপমা দিতে কবিরা পৃথিবী নামক এই গ্রহকে চষে ফেলেছেন। এমন নদী, পর্বত বা প্রান্তর নেই যার সাথে কবিরা তাদের প্রেমিকার দেহ সৌন্দর্যের তুলনা দেননি।

আমার কবিতার আরেক প্রধান বিষয় হলো প্রকৃতি। আমি নিসর্গরাজি অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা সংগুপ্ত প্রেমের মঙ্গলময় ষড়যন্ত্র দেখতে পাই যা আমাকে জগৎ রহস্যের কার্যকারণের কথা ভাবায়। একঝাঁক পাখি যখন গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে বেড়ায়, মাটি ফুঁড়ে বেড়িয়ে আসে পতঙ্গ ও পিঁপড়ের সারি, আর মৌমাছিরা ফুল থেকে ফুলে মধু শুষে ফিরতে থাকে আমি তখন শুধু এই আয়োজনকে সুন্দরই বলি না বরং অন্তরালবর্তী এক গভীর প্রেমময় রমণ ও প্রজননক্রিয়ার নিঃশব্দ উত্তেজনা দেখে পুলকে শিহরিত হই।

আমার মনে আদিম মানুষের মতো অতিশয় প্রাথমিক এক দার্শনিক জিজ্ঞাসা জাগে— কে তুমি আয়োজক? তুমিও কবি? না কবিরও নির্মাতা? তবে তুমি যে অনিঃশেষ সুন্দর আমি তা সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করো প্রভু।

এ ভাবেই আমি ধর্মে এবং ধর্মের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ বীজমন্ত্র পবিত্র কুরআনে এসে উপনীত হয়েছি। একবার জেলখানায় খুব ভোরে সেলের তালা খুলে দেয়া মাত্রই বাইরে এসে দেখি আমার বারান্দার সামনে সিঁড়ির দু'পাশে বেশ বড় ডালিয়া ফুল ফুটে আছে। একটি গাঢ় লাল। অন্যটি প্রগাঢ় হলুদ। উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার যৎসামান্য ধারণা থাকায় আমি একেবারে অভিভূত হয়ে যাই। আমার কেন জানি মনে হলো নির্বোধ প্রকৃতির সাধ্যের সীমানা থেকে অনেক দূরের কোনো অসামান্য ইঙ্গিত ছাড়া এমন অন্তরভেদী প্রস্ফুটন এক অসম্ভব ব্যাপার। আমি আমার এই ছেলেমানুষী চিন্তার কথা আমার সহবন্দি খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতা জনাব মশিহুর রহমানকে বলি। তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটু গম্ভীর হয়ে বলেন, 'সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক তত্ত্বালোচনা ছেড়ে তুমি ধর্মগ্রন্থগুলো একবার পড়ে দেখতে পারো।'

আমি তার মুখে ধর্মের কথা শুনে একেবারে বোকা বনে যাই। এভাবেই আমার বুকের ভেতর ধর্মের কল বাতাসে নড়ে ওঠে। পরের দিনই আমি আমার স্ত্রী সৈয়দা নাদিরাকে সবগুলো ধর্মগ্রন্থ আমাকে জেলখানায় পৌঁছে দিতে বলি এবং পৃথিবীর সবগুলো ধর্মগ্রন্থের এক তুলনামূলক পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ করি।

ফর্‌রুখ আহমদকে একঘরে করে রাখা, তার সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও সাহিত্যিক পরিণাম জানা থাকা সত্ত্বেও আমি ইসলামকেই আমার ধর্ম, ইহকাল ও পারলৌকিক শান্তি বলে গ্রহণ করেছি। আমি মনে করি একটি পারমাণবিক বিশ্ববিনাশ যদি ঘটেই যায়, আর দৈবক্রমে মানবজাতির যদি কিছু অবশেষ ও চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকে তবে ইসলামই হবে তাদের একমাত্র আচরণীয় ধর্ম। এই ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যই আমার কবি স্বভাবকে আমি উৎসর্গ করেছি।

আর যদি সৌভাগ্যক্রমে তেমন দুর্ঘটনা নাও ঘটে তবুও মানুষের দীর্ঘশ্বাসের কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন আমাদের এই দীন পৃথিবীতে মানুষের রচিত কোনো নীতিমালায় কমিউনিজম বা শান্তির রাজ্যে পৌঁছা যাবে না। আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মনীতিই কেবল মানবজাতিকে শান্তি ও সাম্যের মধ্যে পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ দিতে পারে। আমার ধারণা পবিত্র কুরআনেই সেই নীতিমালা সুরক্ষিত হয়েছে। এই হলো আমার বিশ্বাস। আমি এই ধারারই একজন অতি নগণ্য কবি।

বই : কবিতার জন্য বহুদূর